দৈনিক
ইত্তেফাক

28 MAR 2017

প্রফেসর ড. আবদুল খালেক

উচ্চশিক্ষার মান নিয়ে তর্ক-বিতর্ক

উচ্চশিক্ষার মান নিয়ে দেশ জুড়ে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে নানারকম তর্ক-বিতর্ক চলছে। শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন আছে। এই তর্ক-বিতর্ক শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

উচ্চশিক্ষার পরিধি অনেক ব্যাপক এবং বিস্তৃত। আমার আলোচনা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। উচ্চশিক্ষা বলতে আমি অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ের পঠন-পাঠনের কথা বলছি। পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে, দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পরিমাণ ছাত্র-ছাত্রী অনার্স এবং মাস্টার্স পর্যায়ে লেখাপড়া করে, তার চেয়ে অনেক বেশি ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোতে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উচ্চশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে অনেকটা উদারনীতি গ্রহণ করেছেন। গ্রামে-গঞ্জের কলেজগুলোতেও অনার্স এবং মাস্টার্স কোর্স খুলে দেওয়া হয়েছে। অনার্স এবং মাস্টার্স কোর্স খুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে কলেজগুলো নিজেদের প্রতিষ্ঠানকে 'বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ' বলে দাবি করছে। যদিও সে দাবির আইনগত কোনো ভিত্তি নেই।

দেশের সবচেয়ে বেশি ছাত্র-ছাত্রী যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে, সেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই উচ্চশিক্ষার মান নিয়ে আলোচনা শুরু করা যেতে পারে। গত ১৪ মার্চ (২০১৭) মঙ্গলবার রাজধানীর সরকারি কলেজ শিক্ষক পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'মানসম্মত শিক্ষা, বিরাজমান সমস্যা ও করণীয়' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ.আ.ম.স. আরেফিন সিদ্দিক বলেছেন— 'খাতা না দেখেই চূড়ান্ত ফল দেয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। ফলে তাদের শিক্ষার মান কেমন হতে পারে, তা সহজেই অনুমান করা যায়।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এ ব্যাপারে একটি উদাহরণও তুলে ধরেছেন। তিনি জানিয়েছেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের আত্মীয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক। তিনি একবার অনার্সের খাতা নিলেও অসুস্থতার কারণে দেখতে পারেননি। তাই তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানান দ্রুত যেন খাতা নিয়ে যাওয়া হয়। তার দ্বারা খাতা দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু মাসখানেক পার হলেও কেউ খাতার বিষয়ে খোঁজ নেয়নি। এর কিছুদিন পরেই ফলাফল দিয়ে দেওয়া হয়। অথচ তখন অদেখা অবস্থায় কয়েকশ' খাতা ওই শিক্ষকের বাসায় পড়ে ছিল। এই হলো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ালেখার অবস্থা।' এ রকম অভিজ্ঞতার কথা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু কিছু শিক্ষকের মুখ থেকেও শোনা গেছে।

তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বক্তব্য প্রমাণে ব্যর্থ হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে তারা বাধ্য হবেন, এমন কথাও জানিয়েছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আশা করা যায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের আগেই সমস্যাটির সমাধান হয়ে যাবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহোদয় তাঁর অভিযোগের পক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করতে সমর্থ হবেন বলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের ধারণা।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিটি পরীক্ষার খাতা দুইজন করে পরীক্ষক খাতা পরীক্ষণ করে থাকেন। এটি নিঃসন্দেহে উন্নতমানের ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় পরীক্ষার্থীরা ন্যায়বিচার পেয়ে থাকে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্ভবত একজন পরীক্ষক দ্বারাই খাতা মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। সেই একজন পরীক্ষকের মূল্যায়ন ছাড়াই যদি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়ে থাকে, সে ক্ষেত্রে বুঝতে হবে উচ্চশিক্ষা মহাসংকটের সম্মুখীন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি, সে কথা প্রমাণিত হলেই জাতি স্বস্তি অনুভব করবে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে 'সেশনজট' একটি অতি পরিচিত এবং প্রচলিত শব্দ। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সেশনজট আগের তুলনায় অনেকটা কমে গেছে। তবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগ যে সেশনজট মুক্ত হয়েছে, এমন কথা বলা যাবে না। শোনা যাচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলোকে সেশনজট মুক্ত করা হয়েছে। তবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যে প্রক্রিয়ায় সেশনজট মুক্ত করার কাজ চলছে, তা খুব বাস্তবসম্মত নয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিয়মিত পরীক্ষার তারিখ ঘোষণার মাধ্যমে সময়মত পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করছেন, পঠন-পাঠনের দিকে তারা তাকাচ্ছেন না, এর ফলে সিলেবাস অনুযায়ী পঠন-পাঠন ছাড়াই অনার্স এবং মাস্টার্সের শিক্ষার্থীদেরকে পরীক্ষার হলে বসতে হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে আমি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন কলেজ শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলেছি। আমার অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপক। তাদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সিলেবাসের অর্ধেকটা শেষ না হতেই পরীক্ষা হয়ে যাচ্ছে। এর মূল কারণ শিক্ষক সংকট। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত প্রায় প্রতিটি কলেজেই বাংলা বিষয়ে অনার্স এবং মাস্টার্স পড়ানো হয়ে থাকে। আমার পরিচিত এমন একটি কলেজকেই উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা যাক। বিভাগে শিক্ষক সংখ্যা তিন থেকে চারজন। অনার্স এবং মাস্টার্স কোর্সে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীসংখ্যা প্রায় ৫০০। এছাড়া ইন্টারমিডিয়েট এবং ডিগ্রি পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও কম নয়। কলেজে বাংলার যে কজন শিক্ষক আছেন তাদেরকে অনার্স, মাস্টার্স, ডিগ্রি, ইন্টারমিডিয়েট সবখানেই ক্লাস নিতে হয়। জানা গেছে, অনার্সেই পাঠ্যবই রয়েছে ৩২টি। চারজন শিক্ষককে এক বছরে অনার্সের ৩২টি বই পড়াতে হবে, মাস্টার্সের পাঠ্য ১৫টি বই পড়াতে হবে, ইন্টারমিডিয়েট এবং ডিগ্রি ক্লাসে আরো ১০টি বই পড়াতে হবে। অর্থাৎ বাংলার একজন শিক্ষককে এক বছরের মধ্যে মোটামুটি ১২টি বই পড়িয়ে শেষ করতে হবে। কলেজে নানারকম ছুটি থাকে। বছরে হয়তো সাত/আট মাস ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়ের মধ্যে চারজন শিক্ষকের পক্ষে এক বছরের মধ্যে সিলেবাস শেষ করা অসম্ভব। এই পঠন-পাঠনের জন্য প্রয়োজন ৮/১০ জন শিক্ষক। কলেজে অনার্স এবং মাস্টার্স কোর্স খুলবার ক্ষমতা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হাতে আছে কিন্তু শিক্ষক নিয়োগের ক্ষমতা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে নেই। শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি মূলত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হাতে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি কলেজের জন্য শিক্ষক বরাদ্দ রেখেছেন চারজন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি সেই কলেজে অনার্স এবং মাস্টার্স কোর্স খুলবার অনুমতি প্রদান করেন, সে ক্ষেত্রে শিক্ষার সংকট দেখা দিতেই পারে। ইতোমধ্যেই সেই সংকট দেখা দিয়েছে এবং দিন দিন তা তীব্র আকার ধারণ করছে। শিক্ষার্থীদের সিলেবাস শেষ না করে পরীক্ষা নেওয়া অনৈতিক কাজ। আমাদের কলেজগুলোতে সেই অনৈতিক কাজ চলছে। সীমিতসংখ্যক শিক্ষক দিয়ে কলেজে অনার্স-মাস্টার্স পড়াতে গেলে উচ্চশিক্ষার মান নেমে যেতে বাধ্য।

শুধু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের মান নিয়েও সমাজে নানা সমালোচনা বিদ্যমান। নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার চাহিদা পূরণে সক্ষম ছিল না পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। ফলে প্রচুর শিক্ষার্থী নিজ খরচে ভারত বা অন্যান্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করতে যেতো। বিদেশে যাবার প্রবণতা ঠেকানোর জন্য আমাদের দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মের পর প্রথম ১০/১২ বছর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান বেশ ভালো ছিল। মাঝখানে পাঁচ/ছয় বছর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান অত্যন্ত নেমে গিয়েছিল। এর মূল কারণ দেশের বিভিন্ন স্থানে শাখা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। শাখা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মাধ্যমে দেশে শুরু হয়ে যায় শিক্ষা নিয়ে বাণিজ্য। সেই বাণিজ্য ঠেকাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ২০১০ সালে সরকারকে নতুন একটি 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন' প্রণয়ন করতে হয়। ২০১০ আইনটি প্রয়োগের ফলে দেশের যত্রতত্র গড়ে ওঠা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শাখা ক্যাম্পাস বন্ধ হয়ে গেছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতি ইউজিসি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নজরদারি অনেক কঠোর হয়েছে। এর শুভ ফল লক্ষ করা যাচ্ছে। উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নে মেধাবী শিক্ষকের কোনো বিকল্প নেই। মেধাবী শিক্ষক যেখানে আছে, শিক্ষার মান সেখানে উন্নত না হবার কোনো কারণ নেই। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব ক্যাম্পাস এখনো ঠিকমত গড়ে ওঠেনি। এ নিয়ে সমাজে বেশ সমালোচনা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিশাল ক্যাম্পাসের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যাবে না, তবে উন্নতমানের শিক্ষার জন্য বিশাল ক্যাম্পাস অপরিহার্য এমন কথাও বলা যাবে না। ভালো মানের শিক্ষক থাকলে ক্ষুদ্র ক্যাম্পাসেও উচ্চমানের শিক্ষাদান সম্ভব। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো গ্রামে-গঞ্জে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন না করাই ভালো। সেখানে ভালো মানের শিক্ষক পাওয়া যাবে না। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নতমানের পঠন-পাঠনের স্বার্থে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অভিজ্ঞ কিছু খণ্ডকালীন শিক্ষক রাখা অত্যন্ত জরুরি। কাজেই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে শিক্ষক সংকট সমাধান সহজতর হবে। এর ফলে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নত হবে।

উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউজিসি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশেপাশের সাতটি কলেজকে নিজেদের তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস অনুসারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধান মোতাবেক কলেজগুলোতে অনার্স এবং মাস্টার্স কোর্স পঠন-পাঠন এবং ডিগ্রি প্রদান করা হবে।

উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে এটি নিঃসন্দেহে সহজ উদ্যোগ। উচ্চশিক্ষার বৃহত্তর স্বার্থে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বাংলাদেশের অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কেও এগিয়ে আসতে হবে। বর্তমানে দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা সম্ভবত ৩৮টি। এর মধ্য থেকে পুরাতন ১০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় যদি দেশের ১০টি করে কলেজের দায়িত্ব গ্রহণ করে, সে ক্ষেত্রে দেশের ১০০টি কলেজকে উচ্চশিক্ষার সংকট থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোতে উচ্চশিক্ষার মান যে তলানিতে এসে গেছে, এ নিয়ে কোনো রকম সন্দেহের অবকাশ নেই। এক সময় কলেজগুলো যখন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে ছিল, তখন কলেজগুলোর শিক্ষার মান যতটা উন্নত ছিল, এখন তা নেই, এটি বাস্তব সত্য। কাজেই শিক্ষার মান উন্নত করতে হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ অনুসরণ করে অনার্স এবং মাস্টার্স কোর্সের কলেজগুলোকে যত দ্রুত সংশ্লিষ্ট পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসা যাবে, উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের পথ ততোই সুগম হবে।

● লেখক : সাবেক ভিসি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি কলেজের জন্য শিক্ষক বরাদ্দ রেখেছেন চারজন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি সেই কলেজে অনার্স এবং মাস্টার্স কোর্স খুলবার অনুমতি প্রদান করেন, সে ক্ষেত্রে শিক্ষার সংকট দেখা দিতেই পারে। ইতোমধ্যেই সেই সংকট দেখা দিয়েছে এবং দিন দিন তা তীব্র আকার ধারণ করছে। শিক্ষার্থীদের সিলেবাস শেষ না করে পরীক্ষা নেওয়া অনৈতিক কাজ। আমাদের কলেজগুলোতে সেই অনৈতিক কাজ চলছে